ই এম আই

হিমাদ্রী শেখর দত্ত

১

সোমনাথ সকালে বেরোনোর সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলো আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। অফিস সেরে দুজনে আজ এ.সি. কিনতে যাবার কথা আছে। খবরের কাগজে ইনষ্টলমেন্টে এ.সি. কেনার সুবিধা এবং নিজেদের পকেটের অবস্থা, এই নিয়ে কাল রাতে তনিমার সাথে লম্বা কথা সারার পরে আজ মনে মনে ও একটু উত্তেজিতই আছে। বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন বাড়িতে একটাই পাখা ছিলো। রাতে আর ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া সে পাখা রেগুলার চলতো না, মানে বাবা চালাতে দিতেন না। অন্য সময়ে হলদে তালপাতার পাখার লাল সবুজ ছোপ দেওয়া হাতলের মুখটা দিয়ে বাবা পিঠ চুলকোতেন আর নিজেকে হাওয়া করতেন। ছেলেরা পড়তে বসলে, তাদেরও মাঝে মাঝে এক ঝলক হাওয়া করে যেতেন। তনিমার সাথে বিয়ের দু বছরের মাথায়, একেবারে হঠাৎই মাত্র সাতদিনের অসুস্থতায় উনি সোমনাথকে একেবারে একা করে দিয়ে চলে যান। সাত দিনের মরণ-বাঁচন লড়াইয়ের সময় জানা যায় বাবার ক্যান্সার হয়েছে। প্রষ্টেট থেকে ফুসফুসে এসে পৌঁছানোর জন্যে জানা গেল ক্যান্সার বলে, নইলে শুরুটা বছর দুই আগেই হয়ে গেছিল। যখন বিছানা নিলেন, তখন শেষ করে এনেছিলেন নিজেকে সংসারে, সকলের অলক্ষ্যে। তনিমাকে খুব ভালোবাসতেন উনি। আজ বেঁচে থাকলে বেশ খুশী হতেন, ছেলে-বৌয়ের এ.সি. কেনার সামর্থ্য আর প্ল্যান দেখে। ওনার রোজগারে, এ.সি. তখন ছিল মধ্যবিত্তের সংসারে বিলাসিতা। এখন যুগ পাল্টেছে, নির্দিষ্ট সময় ঘুম না হলে, মানুষ পরের দিনের কাজকর্ম করে উঠতে পারে না। অসফল দিন কাটিয়ে, তেতো মেজাজ আর মাথাভরা স্ট্রেস নিয়ে, রাতে বিছানায় কেবল এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ঘুম আর আসে না।

এখন সাড়ে চারটে বাজে, পৌনে পাঁচটা নাগাদ তনিমাকে একবার মোবাইলে ধরবে। ওর বেরোনোর সময়টাও কনফার্ম করতে হবে তো। অবশ্য তনিমাও নিশ্চয় মনে মনে আজ ছটফট করছে। এতক্ষণে কলিগদের কাছে হয়তো বলেও দিয়েছে ওর আজ বিকেলের প্ল্যান নিয়ে। ওরা ভেবে রেখেছে একটু মার্কেট সার্ভে করবে, মানে দু'তিনটে দোকান দেখা আর কি। তাতে দামের ওঠা-নামাটা একটু বোঝা যায়। তবে সেলস ইন্ডিয়াই ওদের মেইন দোকান, যেখান থেকে ওরা মোটামুটি ঘরের অনেক টুকিটাকি এর আগে নিয়েছে। বন্দনা মেয়েটি বয়সে গ্রুপের সবচেয়ে ছোট, তনিমাকে কেবল প্রিন্সিপাল হিসেবে নয়, বড় দিদির মতো দেখে। সে জানতে পেরে বললে, 'ম্যাডাম, সেলস ইন্ডিয়া আজকাল সাড়ে সাতটায় বন্ধ হয়ে যায়, আপনি একটু আগেই বেরিয়ে পড়ুন। স্যার কি আসবেন আপনাকে পিক-আপ করতে?' সোমনাথ একবার ওর বসের ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখে নেয় বস কি করছে। নন-বেঙ্গলি বস, সব সময় অফিসের কম্পিউটারে ইন্টারনেট চষে বেড়াচ্ছে, কি যে এতো দেখে! দুর্জনে নানান কথা বলে বটে, তবে সোমনাথ কখনও হাতে নাতে ধরতে পারে নি। একটা টোকা মেরে ঘরে ঢুকেই সোমনাথ বলে, 'স্যার একটা জরুরী কাজের জন্যে আমায় আজ একটু আগে যেতে হবে, মিসেস'কেও পিক-আপ করতে হবে, আমি আজ পাঁচটায় চলে যাবো।' বস কম্পিউটার থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন 'নো প্রবলেম, গো।' যাক্ এদিকটা তো ম্যানেজ হলো, এবার তনিমাকে ফোন করা যাক।

'হ্যালো, কখন বেরোচ্ছো? আমি কি তোমার ওখানে চলে আসবো?'

'না, আসতে হবে না, আমার স্কুলের একটা ভ্যান ওদিক দিয়েই যাবে, আমায় নামিয়ে দেবে। এই ধর পাঁচটা পনের/বিশ নাগাদ। তুমি ডাইরেক্ট সেলস ইন্ডিয়ার সামনে চলে এসো, আমি আসছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে

হবে, দীপুর টিউশান ক্লাস সাড়ে সাতটায় শেষ হয়। ডাউন পেমেন্টের টাকাটা নিয়ে এসো কিন্তু। ই.এম.আই. আমার জিম্মা। মনে আছে তো?'

'কিন্তু কত দিতে হয়, না হয়, না জেনে কত টাকা তুলব? তার চেয়ে আমি চেক বইটা আনছি সাথে, যা বলবে লিখে দিয়ে দেব। আজকেই তো আর মালটা পাঠাচ্ছে না। আচ্ছা শোন, আমি ভাবছিলাম, দুটো ঘরের জন্যে দুটো মেশিন কিনে নিলে কেমন হয়? বার বার তো আর এসব কেনা হবে না, তুমি কি বল?'

'যদি পারো, তো নিয়ো, দুটোর জন্যে তোমায় কত ডাউন পেমেন্ট দিতে হয় আগে দেখ। আর আমাকেও তো ই এম আই এর ফাইনাল ভ্যালুয়েশানটা জানতে হবে। ঠিক আছে, তুমি পৌঁছে যাও, আমি গেটেই থাকব।'

তনিমার সাথে সোমনাথের আলাপ আর বিবাহের মধ্যে আট বছরের পূর্বরাগ চলেছিল। পাড়াতে সকলে জানতো। তনিমার মা'ও জানতেন। আর সোমনাথ নিজেই বলেছে তার মা'কে, বাবাকে বলার সাহস ছিলো না, ওটা মা'র ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। ওর ছোট ভাই অবশ্য জানত। সরল, হাসিখুশি আর আত্মগরিমায় ভরা পূর্বরাগের তনিমা আর আজকের প্রিন্সিপাল তনিমার মধ্যে সময়ের সাথে সাথে আরও একটা বিশেষ গুণ যোগ হয়েছে। সেটা হলো যে কোন কাজ বা সমস্যার সমাধান করার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সোমনাথের মনে তনিমার জন্যে গভীর ভালোবাসার সাথে একটা নির্ভরতাবোধ জন্ম নিয়েছে। তনিমা এক্সপার্ট দূরদর্শী না হলেও ওর বিচার আর বুদ্ধির যুগলবন্দি কখনও সাংসারিক সমস্যার উৎপত্তি করে নি, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে খুব সহজ সমাধানে কাজ মিটেছে। এই ক্ষমতার জন্যই আজ স্কুল জয়েন করার আট বছরের মধ্যেই, শিক্ষিকা থেকে সহায়িকা প্রিন্সিপাল এবং এখন প্রিন্সিপাল হতে পেরেছে। স্পষ্টবাদিতা আর স্কুলের স্বার্থে ও নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে, যে আজ স্কুল ট্রাষ্টিও তনিমার লেখা রেকমেন্ডেশান বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়।

এত সব জানা ও মেনে নেওয়া সত্ত্বেও এই ২৩ বছরে সোমনাথ মাঝে মাঝেই তনিমাকে কাঁদিয়েছে, কখনও চেঁচামেচি করেছে সামান্য কারণেই, গাঁক গাঁক করে আজে বাজে কথা বলেছে, তখন ওর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল বা প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন শিক্ষা বা ঐতিহ্য ওকে বেঁধে রাখতে পারে নি। মুখের আগল মাথার গরম দমকায় যখন খুলে যায়, তখন কোনও যুক্তি, তক্কো, গপ্পো জানালায় ধাক্কা খেয়ে ঘরে ফেরে না। কানের পাশে দুম দুম করে আওয়াজ শুরু হয়ে যায়, আজ বারো বছর হতে চললো, সোমনাথ প্রেসারের ওষুধ খেয়ে চলেছে। একটু পরে ঠান্ডা হলে বুঝতে পারে কত পেটি কারণে কি ভীষণ চেঁচালো ও। বউ আর মেয়েদের সামনে নিজেকে কেটে কেটে কদর্য্যতার এক একটা প্রতিবিম্ব দেখিয়ে দিল – স্বামী, প্রেমিক, বাবা, কিউট বাবা সব পরিচয়ের সুন্দর সুন্দর পোর্ট্রেটে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিল নিমেষে। অসহায় লাগে, কিন্তু ৪৮ বছর বয়সেও রাগটাকে বাগে আনতে পারলো না সোমনাথ। সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া এই সময় আর কিছু করার থাকে না সোমনাথের। কটা রুটি খাবে মেয়ে এসে জানতে চাইলে বুঝতে পারে এই মুহূর্ত কতটা কঠিন। তনিমা এখন কিছুদিন রিঅ্যাকশন-হীন হয়ে যাবে, যেটা সোমনাথের সবচেয়ে অপছন্দের।

সময়ের চেয়ে বলবান কেউ নেই। পরিচয়ের জ্বলে যাওয়া ওই সব পোর্ট্রেটের ভস্ম থেকে আবার ধীরে ধীরে মাথা তোলে ভালোবাসার ফিনিক্স পাখী। আবার বাতাস হালকা হয়ে আসে ঘরের মধ্যে, আবার শুরু হয় নতুন করে মিলিত জীবনের পথ চলা। আগ্নেয়গিরি ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু বারে বারে ফিরে আসে। কখনও দু'মাস বাদেই, আবার কখনো বছর ঘুরে যায়।

আসলে আট বছর প্রেম করে বিয়ে করলেও, সোমনাথ তনিমার মনের গোপনে ঢুকতে পারে নি। হয়তো সে দরজা খোলা ছিল এক সময়, এখন বিয়ের ২৩ বছর পর ওই দরজা খোলার প্রচেষ্টায় আর কি ভাবে নিজেকে ঢালবে, সেটা সোমনাথ মাঝে মাঝেই ভাবতে বসে। অনেক ভেবে এটাই বুঝেছে, ভাগ্য গুণে বিদূষী

পত্নী পেয়েছে অবশ্যই, তবে বিদূষীর মনটাকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা ওর এখনও আয়ত্ত্বের বাইরেই। এটা তার মনে এক মস্ত ক্ষেদ, আর এর ওষুধ ওর ব্যক্তিসত্ত্বায় আর কবে ডেভেলপ করবে? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন সেলস ইন্ডিয়া পৌঁছে গেছে বুঝতেই পারে নি। তনিমার চেনা আওয়াজে সম্বিত ফিরতেই, দেখে তনিমা ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত নাড়ছে। গাড়ি সাইডে রেখে লক করে কাছে আসার পর, তনিমা বলে উঠলো, 'কার কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিলে, যে নিজের ঠিকানাই পেরিয়ে যাচ্ছিলে?' উত্তরে সোমনাথ গভীর ভাবে তনিমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না, আমি তোমাকেই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম।' তনিমা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে, যার আওয়াজটা, বাতাসে ওহঃ আর হুঃ-র মিশ্রণের মতো শোনাল। এ শব্দব্রহ্মে তনিমার মনের কোন অনির্বচনীয় ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো, সোমনাথ বোঝে না, তনিমার মনের গোপন মণিকোঠায় ভালোবাসার পুরনো দীপ নতুন কোন রোশনি পেল কি?

২

নীল উর্দি পরা দারোয়ান লম্বা সেলাম ঠুকে ভারী কাঁচের দরজা খুলে ধরল। ভেতরে ঢুকেই সোমনাথ আর তনিমা এক অদ্ভুত ঠান্ডা স্বপ্নময় পরিবেশে এসে পড়ল। এমনই ঠান্ডা হবে ওদের ঘর, যখন এ.সি. লাগবে। রোগা বলা যায় না, কিন্তু একেবারেই মোটা নয় এমন একটি মেয়ে (আন্দাজ ১৮-১৯ বছরের), ওদের দিকে এগিয়ে আসে, কি খুঁজছেন এই প্রশ্ন করায় তনিমা কেন জানিনা হঠাৎ চোস্ত ইংরাজীতে বলে ওঠে, 'উই আর হিয়ার ফর এ.সি.।' মেয়েটি নীচে নেমে ডান দিকের সেকশনে যাবার জন্যে বলে, নিজেও সাথে সাথে চলতে থাকে। এ ধরনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের এই এক সমস্যা, জিনিস দেখবার জন্যে হয় একতলা নীচে নামো, অথবা দেড় তলা ওপরে যাও। মনে হয়, এত সামগ্রী একই ফ্লোরে রাখা সম্ভব নয় বলে এমন ব্যাবস্থা।

সিঁড়িতে দু'পা নামবার পরেই সোমনাথের কেমন মনে হল পুরো স্টোরটা একবার ওপর নীচে দুলে গেল ওর চোখের সামনে। ভুমিকম্প নাকি? ছোট করে কাটা চুলের গোড়ায় বিন্দু বিন্দু ঘাম একসাথে মিলে ছোট্ট অববাহিকার মতো ঘাড়ের কাছে যেন ব-দ্বীপের চারপাশে ভেঙে পড়ছে। কপাল আর কানের পাশ দিয়ে পাতলা জলধারা শ্বাপদের মতো ধীরে ধীরে সরে সরে নামছে। মিনিট খানেক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পরে, পায়ে আর মনে যখন একটু জোর এল, তনিমা ততক্ষণে ঐ মেয়েটার সাথে সেলারে প্রায় পৌঁছে গেছে। পাশ ফিরে হঠাৎ সোমনাথকে দেখতে না পেয়ে তনিমা সিঁড়িতে চোখ ফেরায়। তনিমা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই, সোমনাথ হাত নেড়ে, হাঁটুটা দেখায়। আলতো করে ইঙ্গিত করে, ও আসছে। তনিমা জানে আজকাল সোমনাথ হাঁটুতে মাঝে মাঝেই ব্যাথা অনুভব করে, বিশেষ করে সিঁড়ি ওঠা নামার সময়ে। মুহূর্তের মধ্যে তনিমার মুখটা আবার উৎসাহী ক্রেতার মতো হয়ে ওঠে। সোমনাথ আস্তে আস্তে নামা শুরু করে। বাঁ হাতে স্টিলের চকচকে রেলিং ধরে ধরে সেন্ট্রালি এয়ার-কন্ডিশনড মলের সিঁড়ি বেয়ে এক পা এক পা নাবার সময় ও টের পায়, আরও কতটা পথ ওকে নামতে হবে তনিমার কাছে পৌঁছানোর জন্যে। পিঠের জামাটা ভেতরে গেঞ্জির সাথে চেপটে গেছে, ঘামের জন্যে । সোমনাথ নেমেই চলেছে সিঁড়ি ধরে। গরমে এমন হল, নাকি প্রেসারটা আবার বাড়ল আজকে। যতদূর মনে পড়ছে, আজকের ওষুধ তো সকালে ব্রেকফাস্টের সময় নিয়েছিল। আজকাল এই এক প্রবলেম হয়েছে, এ বেলার কথা ও বেলায় মনে করতে পারে না, অথচ কবেকার কত কথা এখনও ছবির মতো চোখের সামনে আসা যাওয়া করে হবহু, যেমন ঘটেছিল।

এ.সি. কর্ণারে পৌঁছানোর পরে এক গ্লাস জল খেয়ে সামনে রাখা কুশন দেওয়া চেয়ারটায় ও বসে পড়ে। যে ছেলেটি, তনিমাকে এ.সি. দেখাচ্ছিলো, সে স্পট এ.সি. থেকে উইনডো সব ধরনের মেশিনের দাম, টনেজ, রং, গ্যারান্টি পিরিয়ড ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস বর্ণনা করে চলেছে। তনিমা তার মাষ্টারী ব্রেন আর ঘরের প্রয়োজন এই দুই এর মধ্যে মেল বন্ধন করার চেষ্টা করে চলেছে। সোমনাথের বেশ লাগছিলো,

তনিমাকে এই কঠিন অঙ্ক কষতে দেখে। সামান্য সময় বসার পরে, এবার একটু ঠিকঠাক লাগায়, সোমনাথ গিয়ে দাঁড়ায়, তনিমার পাশে।

'তুমি কি সত্যিই দুটো এ.সি. কিনবে বলে ভাবছ? তখন কি হয়েছিল, শরীর খারাপ লাগছিল?' তনিমা এক নিঃশ্বাসে জানতে চাইল।

'কি দাম বলছে? না না, তেমন কিছু নয়, মাথাটা একটু ঘুরে গেছিল। এখন ঠিক আছি। ডাউন পেমেন্ট কি দিতে হবে, দুটো একসাথে নিলে?'

তনিমা খানিকটা আত্মস্থ হয়ে বললো, 'শোনো না, আজ বুক করলে ই এম আই-গুলোতে কোন ইন্টারেষ্ট লাগবে না। জিরো ইন্টারেষ্ট!'

'ইয়েস স্যার,' বলে এগিয়ে আসে ছেলেটি, যে এতক্ষণ এ.সি. দেখাচ্ছিল। 'আপনারা আজ বুক করলে, কিছুটা সুবিধে পেয়ে যাচ্ছেন, এক্সট্রা পয়সা লাগছে না, আর ই এম আই-ও কাটা শুরু হবে নেক্সট মাস থেকে।'

সোমনাথের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও মন তৈরী করছে। আস্তে করে বলল, 'তাহলে একটা স্পট এ.সি. আমাদের শোবার ঘরে লাগাই, আর একটা উইনডো মেয়েদের ঘরের জন্যে নিই?'

'নয় হাজার টাকা এখন ডাউনপেমেন্ট হিসাবে দিতে হবে।' তনিমার হিসেব।

সোমনাথের একটা ডাউট ছিলো, ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'স্পট মেশিনটা কি ঘরের বাইরে রাখতে হবে?'

'স্যার ছাদে ফিট করে দেবো, তারপরে তো আর হাত পড়বে না, আপনি বরঞ্চ একটা কভারের ব্যাবস্থা করে নেবেন, তাহলে বৃষ্টির থেকে খানিকটা রেহাই পাবে।'

'কিন্তু ভাই, আমার বদলির চাকরি, তখন আবার নতুন করে পাইপ খোলা, মেশিন খোলা এসব তো করতেই হবে, নাকি?'

'ওহ্ স্যার, তাহলে আপনারা দুটো উইন্ডো এ.সি.-ই নিয়ে যান। স্পট এ.সি.-তে আপনাদের রেকারিং কস্ট অনেক বেড়ে যাবে।'

সোমনাথ আর তনিমা পরস্পরের মুখ দেখাদেখি করে। তবে কি চাকরীতে যতদিন আছে, ততদিন আর স্পট এ.সি. নেওয়া যাচ্ছে না? সোমনাথ তনিমার দিকে ফিরে চোখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি করবে তাহলে?

ফাইনালী দুটো উইন্ডো এ.সি. কিনে, ডাউন-পেমেন্ট আর ই এম আই বাবদ ১০ খানা চেক দিয়ে যখন ওরা সেলারের বাইরে এলো, তখন অন্যান্য সেকশন বন্ধ হতে শুরু করেছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। গাড়িতে বসেই সোমনাথ তনিমাকে বললো, 'যখন ছোট ছিলে, আমার সাথে প্রেম করতে, তখন কি কখনো ভেবেছিলে, এ.সি. কিনতে এসে, খস খস করে চেক সই করবে?'

তনিমা খুব খুশি খুশি মুখে বললো, 'না তেমন করে ভাবি নি, তবে না হবারই বা কি আছে বল। আমরা তো একটু আলাদাই ছিলাম ছোটবেলা থেকে। পড়াশুনো, আদবকায়দা, সংস্কার সব কিছু নিয়ে। তাহলে, এ'টুকু তো আমরা অর্জন করতেই পারি আজ। পারি না?'

সোমনাথ হাসি মুখে সায় দিয়ে গাড়িটাকে রাস্তায় তোলে। সাতটা বেজে পাঁচ, যদি রাস্তা খালি পায়, তবে দীপুকে নিয়ে নিতে পারবে টিউশন থেকে।

৩

এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন লাইন বসিয়ে, জানালায় গ্রীল কেটে দু ঘরে দুটো এ.সি. বসে গেল। সোমনাথ অফিসে থাকাকালীন কোম্পানীর লোক এসে একদিন এ.সি. চেক করে ফুল ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে গেলো। মা-

মেয়ে দুজনে সেসব পুঙ্খানুপঙ্খ মনে রাখল, সোমনাথকে বলবার জন্যে। তনিমা এখন রাত্রে বিছানায় শুয়ে গরমে আর হাঁসফাস করে না, আরামেই ঘুমোয়। সোমনাথ একবার নিজের, একবার মেয়েদের ঘরের মেশিনের অবস্থা যাচাই করে, নিজের ঘরে এসে তনিমার পাশে শুয়ে পড়ে। শোবার আগে এ.সি. তে দু'ঘন্টার টাইমার দিয়ে দেয়। বেশীক্ষণ চলতে থাকলে ঘর একেবারে বরফ হয়ে যায়। এই ভাবেই সোমনাথ আর তনিমার বাসায় দ্বৈত বাতানুকুল যন্ত্রের চরৈবেতি শুরু হয়।

তিন মাস পরে এ.সি.তে যখন আধঘন্টার বেশী টাইমার লাগছে না, একরাতে শুয়ে শুয়ে সোমনাথের মাথায় একটা উদ্ভট ভাবনা আসে। কেবল মাত্র দুটো শব্দ নিয়ে, 'ডাউন পেমেন্ট' আর 'ই এম আই'।

হঠাৎ করে ও বুঝতে পারে এই শব্দ দুটো কেবল কমার্সের টার্মস নয়, অন্ধকার ঘরে ও ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে এই দুটো শব্দের সাথে চাইলে সমগ্র বিশ্ব সংসার জড়িয়ে দেওয়া যায়। চাই কি, এটা বলতে দ্বিধা নেই যে সারা দুনিয়া এই শব্দেরই পরিণাম এবং উৎপত্তি। আমরা সকলেই এর সাথে একটা ক্লোজড লুপ-এ ঘুরে চলেছি সময়ের সীমাহীন প্রবাহে। নিজের এই বোধোদয়ে সোমনাথ খুব উত্তেজিত বোধ করে। তনিমাকে জাগাতে ইচ্ছা হল খুব, এ.সি.-র হালকা সবুজ টেম্পারেচারের ডিজিটাল ইন্ডিকেটরের আলোয় তনিমার ঘুমিয়ে থাকা মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, সোমনাথ মন বদলাল। নিজের নতুন এক্সপ্ল্যানেশনের ব্যাপারে আরো গভীর ভাবে মনোনিবেশ করল। ঘুম উড়ে গেছে চোখ থেকে।

আমরা যা কিছু পাবার স্বপ্ন দেখি, বা আশা করি, বা যে যেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করি, তার জন্যে একটা প্রস্তুতি ছোটবেলা থেকেই নিতে হয়। ওই সময়ের থেকে করে আসা সমস্ত কর্মকাণ্ড, শ্রম, অর্থলগ্নি এসবই হল একটা জীবন নামক ভিত্তি পত্তনের জন্যে ডাউন পেমেন্ট। জীবন যখন লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তাকে আরও এগিয়ে দিতে এবং মেন্টেনইড রাখতে জীবন থেকে কিছু কিছু ভাগ বা অংশ আমাদের ফিরিয়ে দিতে হয়, কখনও সময়ের রূপে, কখনও ভালোবাসার রূপে, বা দায়িত্বসচেতনতার রূপে। সোমনাথের কাছে এগুলো এক একটা ই এম আই। জীবন যেমন দেয়, তেমনই আবার চলার জন্যে জীবনকেও ফিরিয়েও দিতে হয় তার অর্জিত লভ্যাংশের একাংশ। সে লাভের গুড়ে সংসারের সকলেরই ভাগ থাকে।

বাবা-মা'র কথা বিশেষ করে আজ মনে পড়ে সোমনাথের, ওনাদের সারা জীবনের ডাউন পেমেন্ট এর রসিদ নিয়ে ও নিজে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে ও ওর জীবনের সব ভালোবাসার জনেদের জন্যে সব রকম ই এম আই দিয়ে দিতে পারে। বাবা-মা কোন ই এম আই নিয়ে যেতে পারেন নি। তার আগেই তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আর তনিমা সেই ছোট্ট বয়স থেকেই নিজের ক্যারিয়ার, বাবা-মা, ঘর বাড়ি, পারিবারিক ব্রাহ্মণত্য সবই ডাউন পেমেন্ট করেছে কেবল সোমনাথকে ভালোবেসে। কিন্তু সোমনাথ কি তনিমার জীবনে তার প্রাপ্য সব ই এম আই ঠিক ঠিক ফেরত দিতে পেরেছে? কখনও কি ডিফল্টার হয়নি? নিজেকে বিছানায় এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, সোমনাথ বিব্রত হতে থাকল। আস্তে আস্তে মন খুঁজে পেতে থাকল ডিফল্টারের এক একটা বড় ছোট অধ্যায়, যা চাপা পড়ে আছে দৈনন্দিন জীবনের হয়রানিতে। সব মনে আসার পরে, সোমনাথ নিজেকে এক বড়সড় ঠগ বলে মনে করতে লাগল। চাপ চাপ দুঃখবোধ তাকে অন্ধকারে এমন ভাবে জাপটে ধরে, মনে হচ্ছে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। তনিমাকে জাগাবে নাকি, নাকি আরেকটু সহ্য করবে। তীব্র হতাশা থেকে বার বার ওর মনে হতে লাগে, বাবা, মা, সমাজ, শিক্ষক, সংস্কার, শুভবুদ্ধি সব কিছুরই দানে গড়ে তোলা এই জীবনের ডাউন পেমেন্টের মর্যাদা ও ক্ষুণ্ণ করেছে বার বার, ধোঁকা দিয়েছে এদের সকলকে। পাপ আর পুণ্যের সীমারেখা আজ নতুন করে একটা আলাদা মানে নিয়ে এল ওর বিবেকের কাছে। তনিমাকে যদি একবার ডেকে সব বোঝাতে পারত, ওর এখনকার মনের অবস্থাটা। তনি, আমি তোমার কাছে অন্যায় করেছি বেশ কয়েকবার, তোমার কাছে আমার যোগ্যতার পরিভাষা যা নিয়ে তুমি সুখী আছো, তাকে

কলুষিত করেছি। কখনও অজানতে, কখনও লোভে পড়ে, কখনও মোহের বশে, অথবা সামান্য অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে। এক সীমাহীন হাহাকার বুক ফুটে বেরোতে চাইছে, চিৎকার করে বলতে চাইছে, তনি তোমাকে ঠকিয়েছি এই ২৫ বছরের সম্পর্কে, মাঝে মাঝেই, নিজের দুর্ব্যবহারে, রাগ গোয়ার্তুমি আর কখনও বা পরকিয়ার আবছা আভাসে। তুমি জানতে পার নি। বা হয়তো বুঝেছ, আমায় জানতে দাও নি। আমায় কি তুমি সব ভুলে ক্ষমা করতে পারবে? কোথায় যেন পড়েছিলো সোমনাথ, মেয়েরা ক্ষমা করলেও কখনও ভোলে না। আর তাই যখনই সম্পর্কের ই এম আই ভরতে গিয়ে কেউ ডিফল্টার হয়ে যায়, তখন স্মৃতি তার বন্ধ দরজাগুলো খুলে ধরে, আর অভিযোগের ধারালো সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে শাণিত অস্ত্রের সাজে, নতুন রক্তপাতের মহাভারতে। বিবেকের চাপ এমনিভাবে এই দুটো শব্দ নিয়ে এমন ভাবে ওকে নাড়িয়ে দিয়ে যাবে, সোমনাথ এ.সি. কিনতে যাবার সময় কখনও ভাবে নি। ঘুম আসছে না, এক আবছা অথচ তীব্র বেদনায় ও স্থির হয়ে পড়ে আছে ও। গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ঘুমিয়ে তো নেই-ই, কিন্তু ঠিক মতো জেগেও নেই ও এখন। রাত্রির বাতাসেও কোন আওয়াজ নেই।

৪

স্কুলে যাবার আগে রান্না করতে হয় বলে তনিমা বরাবরই সোমনাথের আগে ঘুম থেকে ওঠে। আজও তার অন্যথা নেই। হাতমুখ ধুয়ে সকালের চা'টা বসাবার আগে, ভাবল আজ সোমনাথকেও তুলে দেয়। দু'জনে একসাথে চা খাবে। গতকাল বিকেলে ওদের বড় মেয়ে পরীক্ষা শেষে হোস্টেল থেকে ফিরেছে – আজ তাই ওর মনটা খুব ভালো আছে, আজ একসাথে সকলেই বাড়িতে আছে অনেক দিন পরে। সোমনাথকে ডাকতে যাবে বলে গ্যাসটা সিম করতেই টেলিফোনটা বাজতে শুরু করে। মা ফোন করেছেন বারাসাত থেকে, গত রাতে ওখানে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তোদের ওদিকে কি হয়েছে? রাত্রে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলেও, এদিকে বৃষ্টি হয় নি, তনিমা জানায়। মা-মেয়ের কথা যখন শেষ হলো, তখন সিম করে রাখা জলও পুরো উবে গেছে। নতুন করে আবার জল বসিয়ে তনিমা গেল সোমনাথকে ঘুম থেকে তুলতে।

চিৎ হয়ে মুখ বন্ধ করে, হাত দুটো পাশাপাশি ফেলা, সোমনাথ শুয়ে আছে বিছানায়। তনিমার বুকটা সোমনাথকে দেখে কি জানি কেন কেঁপে উঠলো। এত প্রশান্ত মুখ, কেমন যেন অচেনা ঠেকছে। পা দুটো শোবার ঘরের দরজার কাছে এমন ভারী লাগছে, তনিমা এগোতে চেয়েও যেন এগোতে পারছে না। সোমু সোমু বলে দুবার ডাক দিয়েও কোন সাড়া না পেয়ে, মাটি থেকে উপড়ে পড়া গাছের মতো, তনিমা এসে পড়ল সোমনাথের নিঃসাড় শরীরের ওপরে। তনিমা বুঝতে পারে না ওর এখন কি কি করা উচিত। সোমনাথ এক গভীর ঘুমের মধ্যে রয়েছে, বায়োলজির ছাত্রী তনিমা জানে চালু কথায় এটাকে স্ট্রোক বলে ।

সোমনাথের জীবন স্পন্দন খুব ধীরে ধীরে চলছে। তার দেখবার চোখ, বোঝবার হৃদয় এখনো সম্পূর্ণ ইনেফেক্টিভ নয়, তনিমার মন পড়তে পারলেও নিজের কথা মুখে বলার স্বর ওর নেই, যা তনিমার কানে গিয়ে পৌঁছায়। তোমায় ডাকতে চেয়েছিলাম বারবার, কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারিনি চলে যাচ্ছি, বিশ্বাস কর। অবুঝ অভিমানে আমায় প্লিজ ভুল বুঝো না। ইথারের সমুদ্রে সোমনাথের এই আকুল ইচ্ছে একটা তরঙ্গের মতো দুলতে থাকল।

বড় মেয়েকে বিছানা থেকে তুলে ডাক্তারকে ডাকতে পাঠায়। পারিবারিক চেনা ডাক্তার পুলক চক্রবর্তী ১০ মিনিটের মধ্যেই এসে যান। ডাক্তারের মুখ দেখে তনিমা আন্দাজ করে অবস্থা মোটেই সাধারণ নয়। এ্যাম্বুলেন্সে যখন সোমনাথকে তোলা হচ্ছে, তখনো সোমনাথ মরণের নৌকায় সম্পূর্ণ জীবনসমুদ্র পার হতে পারেনি। গাড়িতে তনিমা উঠে বসল, সোমনাথের সাথে, এক পাথর প্রতিমা। এখন ওর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, মনের মধ্যে কি ঝড় চলছে। দুই মেয়ে মা'কে ঘিরে রয়েছে। আজ ওদের বড় কঠিন পরীক্ষার

সময়। হাসপাতাল অভিমুখে পাড়া প্রতিবেশী দু'এক জন পুলক ডাক্তারের গাড়িতে সঙ্গে চললেন। সঙ্গে ডাক্তার থাকায়, হাসপাতালে বেশী সময় নষ্ট হয়নি, আই সি ইউ এর দুধসাদা ঘরে ধবধবে বিছানায় সোমনাথকে শোয়ানো হলো নানান রকম ডাক্তারী যন্ত্রের সাথে জুড়ে। সোমনাথের জীবন-নৌকার মুখ ঘোরানোর যুদ্ধে ডাক্তাররা লেগে গেলেন। অফিসের লোকজন একটু বেলা বাড়তে, যারা কাছাকাছি ছিল, সকলে এসে হাজির। তনিমা কেবল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে ঘরে নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো?' ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিলেন সিনিয়র ডাক্তার ধ্রুব ভট্টাচার্য্য, তার আগে স্বয়ং ভগবানও নাকি বলবার ক্ষমতা রাখেন না। বললেন, 'দেখ মেয়ে, আমরা আশাবাদী আর ডাক্তারীটাও করব একদম ঠিক ঠাক, কিন্তু তারপরেও কিছু লাগে যা থাকে কেবল মাত্র নিয়তির নিয়ন্ত্রণে। ধৈর্য্য ধর, সব ঠিকই হবে।'

ভোর রাতের দিকে এই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রথম অ্যাটাকটা হয় ঘুমের মধ্যেই। জেগে গিয়েও সোমনাথ কোন কথা বলতে পারে নি, তার ঠিক পাশে শোয়া তনিমাকে। ওর গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরোচ্ছিল না। বুকের এক অলৌকিক ব্যথা ওকে নিয়ে লোফালুফি করছিল, সেটা সহ্যের আওতার বাইরে যেতে ও জ্ঞান হারায়। ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যেই সেকেণ্ড ধাক্কাটা আসে সোমনাথের অগোচরে।

একটা প্রবল ভূমিকম্পের মতো, প্রি- আর পোষ্ট- কম্পন ওকে ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায়। যমে ডাক্তারে টানাটানির ৪০ ঘন্টা পরে সোমনাথের এগিয়ে চলার পথে ব্রেক লাগে বলে ডাক্তার ভট্টাচার্য্য মত দিলেন। তবে অপেক্ষার পালা পুরোপুরি এখনও শেষ হয় নি। তনিমার বুকটা একটু হাল্কা লাগছে, চশমার কাঁচে আর আই সি ইউ এর দেওয়াল থির থির করে কাঁপছে না। এই প্রথম দু'দিনে ও নিঃশ্বাস ছাড়ল। এই দু'দিন সোমনাথের চলার পথে তনিমার শ্বাস-প্রঃশাস সোমনাথকে ওর দরকারী অতিরিক্ত বাতাসটুকু দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। সোমনাথকে ঘরের পথে ফেরানো গেলো অবশেষে। ভর্তি হবার ছ-দিনের মাথায় সোমনাথ জেগে উঠল এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে। বুকে কোন ব্যাথা নেই, কিন্তু সমস্ত শরীর ভেঙ্গে আসছে, এক অনন্ত ক্লান্তি নিয়ে, দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে, যেন কতদিন ঘুমোয় নি ও। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পরে, নতুন হৃদয় নিয়ে, সোমনাথ ১২ দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। কুঁচকির কাছে ফোলাটা খুব ধীরে ধীরে কমে যাবে বলে ডাক্তার বলেছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, হাঁটাহাঁটি শুরু করতে বেশ সময় লাগবে। কৃতজ্ঞ মনে তনিমা বৃদ্ধ ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে যখন সোজা হয়ে উঠল, এক স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে উনি বললেন, 'ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারার জন্যে, তোমার কাছে আমার একটা দেনা থেকে গেল মা। কি করে ফেরত দেব জানি না।'

'কিসের দেনা? দেনা তো আমার, আপনার কাছে,' তনিমার উত্তর।

'ও তুমি ঠিক বুঝবে না মা, আমরা মানে ডাক্তাররা বুঝি।'

তনিমা হঠাৎ বুঝতে পারে জীবনের সহজ অঙ্কটা। আমাদের সকলের জন্যে নির্দিষ্ট ডাউন পেমেন্ট জন্মাবার সাথে সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সকল কর্ম, ভালোমন্দ, ন্যায়, অন্যায়, আশা নিরাশা, লাভক্ষতি, ভালোবাসা আর বিশ্বাস এই সব নিয়ে যে জীবন, তার সঠিক খরচ না হলে, স্রষ্টার দরবার থেকেই মাঝে মাঝে ডিফল্ট ই এম আই-এর নোটিশ আসে। তখন তা মেটাতে গিয়ে, সুদের ভারে জীবনটাকেই বাজি ধরতে হয়। সংসারে সঠিক চলাই হল, ই এম আই-এর ডিফল্টার হবার থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ। একমাত্র উপায়।

ঘরে এসে, সোমনাথকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, একটা তৃপ্তি অনুভব করে তনিমা মনের গভীরে। হাত বাড়িয়ে সোমনাথকে ছুঁয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তনিমার ই এম আই-পেইড এ.সি. ঘরের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়ার ভরপুর অক্সিজেনে, সোমনাথকে ভরিয়ে দিল গভীর ভালোবাসায়।